



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 239 - 246

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

**লিঙ্গকেন্দ্রিক বৈষম্য, স্বার্থপরতা, মুনাফা ও সামাজিক শোষণের আলোকে
তিলোত্তমা মজুমদারের নির্বাচিত ছোটগল্পের বিশ্লেষণ**

সৌরভ সাহা

গবেষক, বাংলা বিভাগ

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: saha86885@gmail.com

 0009-0003-6457-1531

ও

ড. বরণ কুমার সাহা

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID:



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Tilottama
Majumdar,
Short stories,
society,
gender-
politics,
exploitation,
men and
women.

Abstract

Tilottama Majumdar is a socially conscious writer. Society plays a vital role in her literature, especially in short stories. Gender exploitation is one of the aspects of social problems that have become very prominent in Tilottama Majumdar's short stories. Although this issue is very old, it exists in the present society also. In a general sense, gender issues refer to social exploitation and oppression based on gender, mainly by patriarchal society. In this research paper we are discussing the short stories 'Maya', 'Amravati O Sera Putuler Golpa', 'Balkal' etc. In these stories, we find how women are constantly exploited and deprived by male dominating society. With time, the concept and direction of this 'gender discrimination' has also changed. Women who were exploited and oppressed for so long, in modern times, some of them have become exploiters and oppressors by misusing their femininity. Even in some cases, women are constantly exploiting men also for their own self-interest through jealousy, lies, deceit and delusion. In our research work we will focus on these areas that how Tilottama Majumdar portrayed all these gender based social issues in her selected stories and enriched the bengali literature.

Discussion

ভূমিকা : সমাজ ও সাহিত্য অঙ্গঙ্গিকভাবে জড়িত। সমাজ ও সাহিত্য একে অপরের পরিপূরক। নিত্যদিনের সমাজে ঘটে যাওয়া ঘটনার ছাপ ফুটে ওঠে সাহিত্যে। কালের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ পরিবর্তিত হয় ও সাহিত্যে তা প্রতিবিম্বিত হয়।

সাহিত্যে সমাজের প্রতিবন্ধ প্রতিফলিত হয় বলে সাহিত্যকে সমাজের দর্পণও বলা হয়। সমাজ ও সাহিত্যের এই সংযোগের বাহক হলেন সাহিত্যিকগণ। সাহিত্যিকগণ সামাজিক জীব। তাই নিত্যদিনকার সমাজে ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রভাব পড়ে সাহিত্যিকদের মনোজগতে, আর তারই সাহিত্যিক-প্রতিফলন ঘটে তাঁদের সৃষ্টিতে। এক্ষেত্রে সাহিত্যিকরা সমাজের কাছে দায়বদ্ধ। কেননা তাঁদের সৃষ্টির সামাজিক মূল্য রয়েছে। সাহিত্য চিরযুগের। সাহিত্যের বিষয়বস্তু যুগ যুগ ধরে সমাজকে প্রভাবিত করে। তাই সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাহিত্যিক যদি যথেষ্টাচার করেন তবে তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সাহিত্যিক মূল্য ক্ষুণ্ণ হতে পারে। শুধুমাত্র সমাজ-সমস্যাকে তুলে ধরাই সাহিত্যিকের কাজ নয়, সাহিত্যিকের কাজ উত্তরণের পথ দেখানো।

বিশ্লেষণ : বর্তমান সময়ের সমাজে একটি জ্বলন্ত বিষয় হচ্ছে লিঙ্গ কেন্দ্রিক শোষণ ও বৈষম্য, যা সমসাময়িক সমাজ ও সাহিত্যকে ব্যাপক প্রভাবিত করেছে। সাধারণত লিঙ্গ শোষণ বলতে আমরা বুঝি লৈঙ্গিক-বৈষম্য। বহু প্রাচীনকাল থেকে আমাদের সমাজে এই ধারণা বিদ্যমান। সামাজিক রীতি-নিয়মের দ্বারা লৈঙ্গিক-বৈষম্য তৈরি করে একশ্রেণির প্রভুত্ব কায়ম করতে অপর শ্রেণিকে দমিয়ে রাখা, শোষণ করা, নির্যাতন করা ও তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি লিঙ্গ বৈষম্য তথা শোষণের অংশ। এক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে নারীরাই লিঙ্গ কেন্দ্রিক শোষণ ও ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে এসেছে। সমাজে প্রচলিত সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, ডাইনি প্রথা, সেবাদাসী তথা দেবদাসীপ্রথা ইত্যাদি এর প্রমাণ। সমাজে পুরুষ আপন প্রভুত্ব কায়ম করার জন্য বিভিন্ন রীতি নিয়মের বেড়াজালে সময়ে-সময়ে নারীকে অবদমিত করেছে। ‘মনুস্মৃতি’তে রয়েছে, নারী শৈশবের পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর ও বার্ষিক্যে পুত্রের। এমনই নানান রীতি-নিয়ম সৃষ্টি করা হয়েছিল নারী জাতিকে অবদমিত করে পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘নারীর মূল্য’ প্রবন্ধে সহমরণ প্রথা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

“যাহাই হোক, নারীর জন্য সতীত্ব, পুরুষের জন্য নয়। এ সতীত্বের চরম দাঁড়াইয়াছিল সহমরণে। কবে এবং কি হইতে ইহার সূত্রপাত, সে-কথা ইতিহাস লেখে না।”

আবার এই সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হলে সমাজে পুরুষের আধিপত্য বজায় রাখতে বিধবাদের দেবী প্রথার প্রচলন শুরু হয়। যেখানে – “লোকাচারের দোহাই দিয়া, সুনীতির দোহাই দিয়া, যত রকমের কঠোরতা কল্পনা করা যাইতে পারে, সমস্তই সদ্য-বিধবার মাথায় তুলিয়া দিয়া, তাহাকে প্রত্যহ একটু একটু করিয়া দেবী করা হইতে লাগিল। সে নিরাভরণা, সে একবেলা খায়, সে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে, থান-ফাড়া কাপড় পরে, কেন-না সে দেবী। চীৎকার করিয়া পুরুষ প্রচার করিতে লাগিল, আমাদের বিধবার মত কাহার সমাজে এমন দেবী আছে।

বিবাহের ছাদনা-তলায় ঢুকিতে দেওয়া হয় না-পাছে দেবীর মুখ দেখিলেও আর কেহ দেবী হইয়া পড়ে। মঙ্গল-উৎসবে দেবীর ডাক পড়ে না, দেবীর ডাক পড়ে শ্রাদ্ধের পিণ্ড রাঁধিতে।”^২ অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে দেবী প্রথার আড়ালে সমাজের সকল প্রকার আনন্দ ও মঙ্গল অনুষ্ঠান থেকে বিধবা নারীদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। ‘বিদ্ব মঙ্গল’ নাটকেও নারী অবদমনের ছবি দেখতে পাই। পরবর্তী সময়ে বেগম রোকেয়া, আশা-পূর্ণা দেবী, তসলিমা নাসরিন প্রমুখের লেখায় এ বিষয়গুলি উঠে এসেছে। তবে শুধু যে নারীরাই এই লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার তা নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণাও বদলেছে। শোষিত-বঞ্চিত নারীদের সমাজে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন আইন-কানুন প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে লিঙ্গ-রাজনীতির আড়ালে নারীর শোষণ ও নির্যাতন হ্রাস পেলেও, ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে পুরুষরাও এর শিকার হচ্ছে। তাই বর্তমান সমাজে নারীরা যতটা লিঙ্গ-বৈষম্য ও ষড়যন্ত্রের শিকার ঠিক ততটাই পুরুষরাও।

তিলোত্তমা মঞ্জুদার একজন অত্যন্ত সমাজ সচেতন লেখিকা। সমাজের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়গুলি তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও সাহসের সঙ্গে তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে। লিঙ্গ চেতনা তাঁর সাহিত্যের এক অন্যতম আলোচ্য বিষয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সমাজের রূপ বদলেছে। রীতি-নীতি, নিয়ম-শৃঙ্খলা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু কিছু প্রাচীন রক্ষণশীল চিন্তাধারা আজও সমাজের গভীরে অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। বিশেষ করে কন্যা ও পুত্র সন্তানের ভেদাভেদ। এটি মধ্যযুগীয় রক্ষণশীল ভাবনা হলেও তার শেকড় বর্তমান সমাজের গভীরে রয়ে

গেছে। যার প্রমাণ তিলোত্তমা মজুমদারের ‘মায়া’ গল্পটি। এ গল্পে আমরা দেখব, এক বনেদি পরিবারের শিক্ষা ও বনেদিয়ানার অন্তরালে লুকায়িত রক্ষণশীল চিন্তাধারার মাধ্যমে সমাজের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। একুশ শতকের যে সমাজ নারী পুরুষের সমঅধিকারের কথা বলে, সেই সমাজই আবার যে নারী পুরুষের বিভেদ তৈরি করেছে তা দেখানো হয়েছে সোনালীর সন্তান প্রসবের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও কন্যা সন্তানের জন্ম এ সমাজ এখনও স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিতে পারেনি। তাই আমরা গল্পটিতে দেখি, সোনালী কন্যা সন্তান প্রসব করলে শ্বশুর বাড়ির লোকজন তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সোনালির শাশুড়ি একটি পাঁচ টাকার মুদ্রা দিয়ে নাতির মুখ দেখে বলেন—

“সোনার গিনি দিয়ে নাতির মুখ দেখবো ভেবেছিলাম সেই গিনি পরের বারের জন্য রেখে দিলাম কিন্তু ছোট বউমা।”^৩

এমনকি আয়াকে তার পারিশ্রমিক দিতে গিয়ে তিনি বলেন—

“নাতি আনলে তোমায় একজোড়া সোনার দুলা দিতুম। ঠাকুরকে বলি, যেন পরেরবার পাও।”^৪

এরই এক বিপরীত চিত্র ধরা পড়ে গল্পের শুরুতে, যেখানে ডাক্তার বাবু মায়াকে তার মেয়েদের সম্পর্কে বলেছেন—

“খুব ভালো। মেয়েদের পড়াও। মানুষ করো। শিক্ষিত মায়ের সন্তান ওরা। ঠিক দাঁড়িয়ে যাবে।”^৫

গল্পটির মধ্যে লেখিকা একদিকে যেমন আধুনিক সমাজের ছবি তুলে ধরেছেন পাশাপাশি দেখিয়েছেন সমাজের অতলে লুকিয়ে থাকা রক্ষণশীল চিন্তা ভাবনার দিকটি। তাইতো গল্পের শেষে আমরা দেখি—

“ও হেঁচট খেল হঠাৎ। কোনও রকমে সামলে দেখল কীসের মোটা শিকড়। ও পিছন ফিরে তাকাল একবার। দেখল প্রাসাদোপম বাড়িটাকে। প্রাচীন গন্ধ পেল।”^৬

এই শিকড় হচ্ছে প্রাচীন রক্ষণশীল ভাবনার শিকড়, যা সমাজ মননের গভীরে আজও ছড়িয়ে রয়েছে। আধুনিক ও শিক্ষিত হলেও প্রাচীন গন্ধ অর্থাৎ প্রাচীন ভাবনা থেকে বর্তমান সমাজ পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি।

‘অমরাবতী ও সেরা পুতুলের গল্প’ গল্পে আমরা দেখি যৌনপল্লীর প্রতিচ্ছবি। সেই সু-প্রাচীনকাল থেকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীদেহকে ভোগ্য পণ্য হিসেবে উপভোগ করে আসছে ও বর্তমান সমাজেও সেই ধারা অক্ষুণ্ণ হয়েছে তারই প্রতিচ্ছবি লেখিকা আলোচ্য গল্পে তুলে ধরেছেন। তাইতো গল্প-মধ্যে বলা হয়েছে—

“পছন্দের পুতুলের জন্য নির্দিষ্ট স্বর্ণমুদ্রা দেয় যুবকেরা এবং প্রতিনিধিরা পুতুলটিকে হাতে তুলে দেয়। পুতুলদের যার যার নিজস্ব কক্ষ আছে। মধুর হেসে যুবকদের কক্ষে দিয়ে যায় তারা। পুতুলগুলি ব্যবহারের সময়সীমা বারো ঘন্টা। এর মধ্যে যুবকেরা উদ্দাম হতে পারে। পুতুলদের দিয়ে গা টিপিয়ে নিতে পারে আর যার যার ক্ষমতা অনুযায়ী এক থেকে দশবার যৌনসঙ্গম করতে পারে।”^৭

পুতুল যেমন সূত্রধারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তেমনই অমরাবতীর পুতুল অর্থাৎ যৌনপল্লীর নারীদের জীবন পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শুধু তাদের জীবন নয়, তাদের সকল আবেগ অনুভূতির প্রকাশও পুরুষ সমাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যতক্ষণ সে বিনা প্রতিবাদে পুরুষতন্ত্রের চাহিদা মিটিয়েছে, ততক্ষণ সে অমরাবতীর সেরা পুতুল, ততক্ষণ তার কদর। কিন্তু যেই মুহূর্তে সে তার শ্রেষ্ঠ যুবকের কাছে নিজের অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়ে অধিকার দাবী করেছে, সেই মুহূর্তেই সমাজ তাকে ধ্বংস করার পক্ষে রায় দিয়েছে। সেরা পুতুলের আবেগের এই বহিঃপ্রকাশ শ্রেষ্ঠ যুবকের কাছে বাতুলতা মনে হয়েছে, -

“কিন্তু শ্রেষ্ঠ যুবক ক্রোধে উন্মত্ত। সেরার বাতুলতা তার কামপ্রবাহকে বাধা দিয়েছে। তা ছাড়া পুতুল তার নিজের স্বাধীন অনুভূতি ও ইচ্ছা কথা বলেছে। কোনও কিছুই মেনে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে দু’হাতে তুলে ধরল সেরাকে আর মাটিতে আছড়ে ফেলল।”^৮

অর্থাৎ এই বৈষম্যের সমাজে প্রতিনিয়ত খর্ব হয়েছে নারীর অধিকার। নারীকে সমাজনীতির আড়ালে পুরুষ শুধুই ভোগ করেছে। আর যে মুহূর্তে তার স্বার্থে আঘাত লেগেছে কিংবা নারী তার আপন অধিকারের কথা ব্যক্ত করেছে, তৎক্ষণাৎ

তাকে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরুষের কাছে তার দেহ ব্যতীত অন্য কোনো আবেগ-অনুভূতি মূল্যহীন। তাই তো লেখিকা বলেছেন—

“...তার নীল চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা জল। সুখশহরে কেউ জানে না এর নাম অশ্রু।”^{১৬}

নারীদেহ ভোগ তথা যৌনপল্লীর কাহিনি সুপ্রাচীন হলেও বর্তমান সমাজেও তার কোন পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। আজও একশ্রেণীর পুরুষের কাছে নারী শুধুই ভোগ্য, এই গল্পটি তারই জীবন্ত উদাহরণ। গল্পমধ্যে লেখিকা সমাজে প্রচলিত লিঙ্গ-শোষণের দিকটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

শিক্ষা ক্ষেত্রেও এই একই বিষয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করি। স্বাভাবিক ঈর্ষা, আত্ম-অহংকার ও লিঙ্গ-রাজনীতির কবলে পড়ে বহু মেধা অযাচিত অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সমাজে এ এক জ্বলন্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই এক বাস্তব ছবি ধরা পরে তিলোত্তমা মজুমদারের ‘বন্ধল’ গল্পটির মধ্যে। গল্পমধ্যে লেখিকা অতসী এবং অর্কদীপ চরিত্র দুটির মাধ্যমে বিষয় উপস্থাপনা করেছেন। অতসী সমাজের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে, তার বাবার একটি ছোট মুদির দোকান। অপরদিকে অর্কদীপও মেধাবী ছাত্র। তার বাবা দীপেশ মুখোপাধ্যায় কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক ও মা নন্দিতা মনোহারিণী দেবী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অর্কদীপের পরিবারের সমৃদ্ধ হলেও, মেধার তালিকায় অতসী সেরা। অর্কদীপ মাধ্যমিক পরীক্ষায় চূয়াত্তর শতাংশ নম্বর পেয়ে দীপেশবাবুর কলেজে বিজ্ঞান শাখায় নামভর্তি করে। অপরদিকে আশি শতাংশ নম্বর পেয়েও অর্থনৈতিক কারণে একই কলেজে নাম ভর্তি করে অতসী। এখানেই তাদের প্রথম পরিচয় ও ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। গল্পের ভাষায়—

“এরই মধ্যে যে অতসীর সঙ্গে অর্কদীপের বন্ধুত্ব গাঢ় হল তার কারণ অংশু স্যারের কাছে তারা একযোগে ফিজিক্স পড়তে শুরু করেছিল।”^{১৭}

একসঙ্গে টিউশন পড়া থেকে শুরু করে প্রায়িকাল করা, অর্কদীপের বাড়িতে গিয়ে দু’জনে মিলে পড়ার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন তাদের মধ্যে ভালোবাসা দানা বেধে উঠেছিল, তেমনই দু’জনে মন দিয়ে পড়াশোনায় মেতেছিল। কিন্তু বিষয়টি দীপেশবাবু ভালো চোখে দেখেননি। একজন সামান্য মুদিওয়ালার মেয়ে হয়েও পড়াশোনায় মেধাবী, জয়ন্টের স্বপ্ন দেখা তার পুরুষত্বে আঘাত করেছিলো। তাইতো তিনি বিদ্রূপ ও অপমান করে অতসীকে বলেছেন—

“অঃ! তাই বলো। জয়ন্টের স্বপ্ন তো আজকাল মুড়ি-মুড়কি সকলেই দেখছে। ...তা দীপের সঙ্গে এ বাড়িতে বসে পড়া দেখি। দীপের নোটগুলো নিতে আসো, নাকি?”^{১৮}

এ শুধু দীপেশবাবুর ভাবনা নয়, সমাজে যখনই কোনো নারী কোনোকিছুতে পুরুষকে অতিক্রম করেছে কিংবা অভাবনীয় কোনো কাজ করে তখনই সে সকলের চক্ষুশূল হয়েছে। এখান থেকেই তাদের মধ্যে এক গোপন প্রতিযোগিতার সূত্রপাত ঘটে। অতসী চায় উত্তম ফলাফলের মাধ্যমে নিজেকে প্রমাণ করতে, অপরদিকে দীপেশবাবুর প্রতিযোগিতা চলে গোপনে। তাই উচ্চমাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষায় আটাত্তর শতাংশ অর্থাৎ অর্কদীপের থেকে পঞ্চাশ নম্বর বেশি পেয়ে প্রথম হলেও, ফাইনাল পরীক্ষায় সে অর্কদীপের থেকে পনেরো নম্বর কম পেয়ে দ্বিতীয় হয়। অর্কদীপের মার্কশীট হাতে নিয়ে অতসী দেখতে পায়—

“ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজি প্রায়িকালে চল্লিশে অর্কদীপ পেয়েছে আটত্রিশ, সাঁত্রিশ, ঊনচল্লিশ। সে পেয়েছে তিনটিতেই যথাক্রমে কুড়ি, কুড়ি এবং কুড়ি।”^{১৯}

নম্বরের এই ব্যবধান অতসীর মনে প্রশ্ন জাগায়—

“প্রাকটিকাল পরীক্ষা এত খারাপ দিয়েছিল সে? এত খারাপ?”^{২০}

এ প্রশ্নের উত্তরও তার জানা। কিন্তু কোনো প্রতিবাদ সে করেনি। কেননা “তাকে এই কলজেই পড়তে হবে। এবং এভাবেই।”^{১৪} তার বুঝতে বাকি থাকে না যে আভ্যন্তরীণ চক্রান্তের শিকার সে। এও বুঝতে পারে যে এর পেছনে কে রয়েছেন। যার প্রমাণ পাওয়া যায় অর্কদীপকে লেখা তার শেষ চিঠিতে— “দীপেশ স্যার যেদিন আমাকে বলেছিলেন, তোর নোটস হাতিয়ে নেবার জন্যই আমি তোদের বাড়ি পড়তে যাই-না, ‘হাতিয়ে নেওয়া’ শব্দটা উনি ব্যবহার করেননি, কিন্তু মানেটা তাই দাঁড়ায়-সে-দিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তোর চেয়েও ভাল রেজাল্ট করে স্যরের কথার জবাব দেব। এবং তোর কোনও সাহায্য আর নেব না। সাহায্য যে নিইনি তা তুই-ই সবচেয়ে ভাল জানিস। বরং সাহায্য করেছি তোকে। বহুবার। কিন্তু কপাল খারাপ। শেষরক্ষা হল না। স্যরের জন্য সে-দিন তুই-যাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসতাম-সেই তুই, আমার প্রতিযোগী হয়ে গিয়েছিলি। আজ আমি সেই প্রতিযোগিতায় হেরে গেলাম। কেন হারলাম দীপ? কীভাবে হারলাম? রবীন্দ্রনাথের ‘মুকুট’ নাটক পড়েছি। সেখানে তিরনিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় সেরা তিরন্দাজ ইন্দ্রকুমারকে অনায়াসে হারিয়ে দিয়েছিল রাজধর। কীভাবে? পারলে পড়ে নিস সে-কাহিনী।

তবু প্রতিযোগিতা-প্রতিযোগিতাই। এবং হেরে যাওয়া-হেরে যাওয়াই। তাই, আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। আমার তো আর কিছুই ছিল না, শুধু অহঙ্কারটুকু ছিল। রূপ নয়, অর্থ নয়, সামাজিক সম্মান নয়— শুধু একটা ছোট গণ্ডিতে শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার। সেও যখন রইল না তখন তোর সমানে কেমন করে দাঁড়াই!”^{১৫} অতসী ও অর্কদীপ সহপাঠী হলেও প্রতিযোগিতা তাদের মধ্যে ছিল না। প্রতিযোগিতা গড়ে ওঠেছিল দীপেশবাবুর পৌরুষত্ব ও অতসীর মেধার মধ্যে। একজন অতিসাধারণ ঘরের সামান্য মুদিয়ালার মেয়ে একটিমাত্র টিউশন পড়ে ফাস্ট হবে, অথচ একজন অধ্যাপকের ছেলে অর্কদীপ সমস্ত বিষয়ে টিউশন পড়েও দ্বিতীয় হবে এটা তিনি মেনে নিতে পারেননি। এ বিষয়টি তার পৌরুষে আঘাত করে। যার ফলে নিজের আত্ম-অহংকার বজায় রাখতে অতসীর মতো একজন মেধাবী ছাত্রীর বিরুদ্ধে নোংরা ষড়যন্ত্র করেন। যেখানে তার পুরুষশালি অহংবোধের কাছে হেরে যায় নিষ্পাপ মেধা। এই হার শুধু অতসীর নয়। তার মতো অজস্র মেধা এভাবে দিনের পর দিন চক্রান্তের শিকার হয়ে সমাজের অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। যার জীবন্ত দলিলচিত্র এই গল্পটি।

শুধুমাত্র নারীরাই যে লিঙ্গ কেন্দ্রিক শোষণ, বৈষম্য ও ষড়যন্ত্রের শিকার তা নয়। বর্তমান সময়ে একাংশ নারী মুনাফা লাভের জন্য তাদের নারীত্বের অপব্যবহার করছে, ফলত পুরুষরাও তাদের চক্রান্তের শিকার। একসময় যে নারীসমাজ শোষিত, নির্যাতিত হতো আজ তারা হই উঠেছে শোষক। এই শোষণ বর্তমান সামাজিক এক সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। যার প্রতিফলন ঘটেছে সাহিত্যেও। তিলোত্তমা মজুমদারও তাঁর একাধিক গল্পে বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন। এর প্রমাণ মেলে ‘পরি, যক্ষিনী, অন্নপূর্ণারা’ গল্পে। এ-গল্পে আমরা দেখব শ্রীমা বাইন্ডারের তাপসবাবু অঙ্গরা, পরী, যক্ষিনী নামক তিন নারীর দ্বারা কীভাবে শোষিত ও ধর্ষিত হন। বর্তমান সমাজে শুধু নারীরাই যে ধর্ষিতা, তা নয়। পুরুষরাও বিভিন্ন ভাবে ধর্ষণের শিকার। আলোচ্য গল্পে এ-বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন লেখিকা। তাপসবাবু শ্রীমা বাইন্ডারের কর্ণধার। প্রকাশনার সূত্র ধরে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে তার পরিচয়। সেই সুবাদেই তাপসবাবুর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় পরির। পরি কবিতার বই প্রকাশের জন্য পাণ্ডুলিপি নিয়ে আসেন। কথাবার্তার পর পরি তাপসবাবুকে অশ্লীল ইঙ্গিত দেন, “এবার পরি উঠলেন। তাঁর জরির কাজ করা আঁচল বুক হতে খসে পড়ল। দুটি অপার্থিব স্তন। তিনি আঁচল তুললেন না। ‘যদি বই করেন - এ দুটি তিন দিনের জন্য আপনার।’”^{১৬}

এরপর আসেন নৃত্যবিশারদ অঙ্গরা। তিনি আত্মজীবনী প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাপসবাবুকে অশ্লীল ইঙ্গিত দিয়ে বলেন—

“আমি কিন্তু নৃত্য ভুলিনি। ইদানীং নগ্ননৃত্য অভ্যাস করেছি। উপন্যাস প্রকাশিত হলে আপনাকে তিন রাত্রি দেখাব সে-নৃত্য।”^{১৭}

পরি-অঙ্গরার মতোই যক্ষিনীও তার ইতিহাসের গ্রন্থ প্রকাশের জন্য তাপসবাবুকে অশ্লীল ইঙ্গিত প্রদান করেন। তাপসবাবু প্রতিবারই তাদের ফিরিয়ে দেন। তিনি আত্ননাদ করে বলেন—

“হে ভগবান। ...আমি বৃদ্ধ হয়েছি। আমার কন্যা বিবাহিতা। এসবে আমার আর কী প্রয়োজন।”^{১৮}

তিনি সিদ্ধান্ত নেন পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু এসবের পরও যখন তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না, তখন একদিন সন্ধ্যায় তারা তিনজন একসঙ্গে আসেন—

“তিন নারী ক্রমশ কাছে এলেন। পরি এসে বসলেন দক্ষিণে উরুতে। অঙ্গরা বসলেন বামে উরুতে। আর যক্ষিণী মানুষটির মুখ টেনে নিলেন নিজের জমাট তীক্ষ্ণ স্তনে। এবার মানুষটি অসহায়ভাবে প্রজ্জ্বলিত হলেন। বিস্মৃত হলেন তাঁর বয়স। অবস্থান। নীতি। তিনি মোহিত। প্রায় মূর্ছিত। রত হলেন এক যৌথ ক্রীড়ায়।”^{১৯}

যাবার আগে তারা জানিয়ে গেলেন— “কাল আবার আসব।”^{২০} এভাবেই বর্তমান সময়ে একাংশ নারী অতি অল্প সময়ে বিনা পরিশ্রমে সাফল্য অর্জনের মাধ্যম হিসেবে বেছে তাদের দেহকে। কখনও স্বেচ্ছায় আবার কখনও অনিচ্ছায় এর শিকার হচ্ছে একাংশ পুরুষ। ঠিক যেমন ভাবে পরি, অঙ্গরা ও যক্ষিণীর শিকার হয়েছে তাপসবাবু। যদিও লেখিকার উদ্দেশ্য ভিন্ন তবুও পুরুষরাও যে লিঙ্গ-শোষণের শিকার, পুরুষরাও যে নারী দ্বারা নির্যাতিত ও শোষিত; এই গল্পটিতে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

উপরোক্ত গল্পের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর রচিত ‘নাগরী’ গল্পেও। এখানেও আমরা দেখব কীভাবে গণেশ ও গোপাল নামের দুই যুবক বুনকা নামক এক নারীর মিথ্যে প্রণয়ের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়ে অকালে প্রাণ হারায়।

“গণেশ ও গোপাল আশৈশব বন্ধু। অভিন্নহৃদয় বললেও অতুল্য হয় না।”^{২১}

পারিবারিক দিক থেকেও তারা ঘনিষ্ঠ ছিল। তাদের ঘনিষ্ঠতা এতটাই গভীর ছিল যে তারা একে অপরের বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারত না। তারা একে অপরের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত, একে অপরের পথ-বিপথের চিরসঙ্গী। তবে তাদের এই বন্ধুত্বে ছেদ ধরায় বুনকার ঝুটো প্রেম। বুনকা শহরে এলে গোপাল ও গণেশ দুজনেই বুনকার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে—

“তাদের অন্তরে যে প্রেম, তাদের পুরুষোচিত স্বভাবে নারী সম্পর্কে যে কৌতূহল, মেয়েমানুষের জন্য শরীরে যে কামনার জোয়ার— সব, সমস্ত, সম্যক ধাবিত হয়েছিল ওই বুনকার প্রতি, কারণ, সে দেহপসারিণী ছিল না ঠিকই, কিন্তু তার রূপ ও যৌবনভার, তার লাস্য ও আকর্ষণী মোহিনী আহ্বান— দুই বন্ধুর কাছেই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল।”^{২২}

তবে গোপাল-গণেশের প্রতি বুনকার আবেগ শুধুই ছিলনা। গোপাল-গণেশের অর্থ ও সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জন্যই এই ছিলনা। প্রথমত দু’জনে একই সঙ্গে বুনকার কাছে গেলেও ক্রমশ বুনকার প্রতি তাদের আবেগ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে—

“গণেশ ও গোপাল দু’জনেই বুনকাকে ছুঁতে চায়, কাছে পেতে চায়। বুনকার কাছে নিজেকে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্য দু’জনেই লভ্যাংশের অনেকটাই ব্যয় করতে লাগল তার জন্য।”^{২৩}

যাদের বন্ধুত্ব দিয়ে সমগ্র গ্রাম চর্চা করত, এক মেয়েকে নিয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। দু’জনেই আলাদাভাবে একান্ত নিজের করে পেতে চায় বুনকাকে। এ-নিয়েই তাদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়, -

“দু’জন তাকাল দু’জনের দিকে। বৈরী চোখ। রাগী মুখ। একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে আরও একটি বন্ধুত্ব বিচ্ছেদের সূত্রপাত হল।”^{২৪}

আমাদের সমাজে এমন কিছু মানুষ রয়েছে যারা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরের ক্ষতি করতে পিছুপা হয় না। বুনকা সেই শ্রেণির প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র। ছলনার মাধ্যমে সমাজের বৃত্তশালী ও ধনবান লোকদের শোষণ করে সম্পত্তি আত্মসাৎ করাই তার কাজ, -

“শহরের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে হাতের মুঠোয় না রাখলে চলবে কেন! তার জন্য ছলনাকে করে তুলতে হবে সত্যের মতো। সত্যকে মিথ্যায় গুলে করে দিতে হবে দুর্বোধ্য।”^{২৫}

এই উদ্দেশ্যে সে গণেশ ও গোপালকে তার ছলনার শিকার বানিয়েছিল। বুনকা তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শুধুমাত্র গণেশ ও গোপালের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বে ছেদ ঘটায়নি বরং তাদের সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করে তাদের মেরে ফেলার পরিকল্পনা করে। তার প্রতি গণেশ ও গোপালের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে বুনকা তাদের একে অপরের প্রাণঘাতী করে তুলে যার প্রমাণ মেলে তাদের বক্তব্যে—

“গোপাল বলল, ‘তোকে আজ মরতে হবে গণেশ। মদে বিষ ছিল’।

গণেশ ঘোলাটে চোখে তাকাল। বলল— ‘মরতে তোকেও হবে গোপাল। মাংসে বিষ ছিল। বুনকা চেয়েছিল তোকে শেষ করতে। আমি করেছি। ও চেয়েছিল আমার ব্যবসায়ের অংশ। দিয়ে দেব। সব দিয়ে দেব। আমার প্রেমের প্রমাণ।’ ...আমার কাছে তোর মৃত্যু চেয়েছিল ও। আমারও সম্পত্তি চেয়েছিল।’
”২৬

বুনকার এই মিথ্যে প্রণয় ও ছলনা অবশেষে বুঝতে পেরে তারা আক্ষেপ করে বলেছে, -

“আমরা কি ভীষণ বোকা গণেশ। একটা মেয়ে মানুষ আমাদের সব শেষ করে দিল।”^{২৭}

কিন্তু তারা যখন বুনকার এই ছলনা বুঝতে পারে ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়। তাদের কিছু করার থাকে না। ফলত দুটি তাজা প্রাণ এক নারীর ছলনার শিকার হয়ে বেঘোরে মারা যায়। শুধু যে নারীরাই পুরুষ দ্বারা শোষিত, প্রতারিত ও বঞ্চিত তা নয়। এর বিপরীত ছবিও আমাদের সমাজে বিদ্যমান। যেখানে নারীর ঈর্ষা, ছলনা ও মোহের শিকার হচ্ছে হাজার হাজার পুরুষ এবং তা যে কতটা বীভৎস ও ভয়ানক তারই জীবন্ত প্রমাণ এই গল্পটি।

উপসংহার : তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটগল্পে সামাজিক সমস্যার যে দিকগুলি অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে তার মধ্যে লিঙ্গ-চেতনা অন্যতম। এ বিষয়টি সুপ্রাচীন হলেও বর্তমান সমাজেও বিদ্যমান। সাধারণ অর্থে লিঙ্গ-শোষণ, বৈষম্য বলতে বোঝায় লিঙ্গভেদে সামাজিক শোষণ তথা নির্যাতন। মূলত পুরুষ সমাজ দ্বারা নারীর শোষণকেই এখানে প্রধান রূপে বিবেচনা করা হয়। এই ধারণাই সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। আমাদের আলোচ্য ‘মায়া’, ‘অমরাবতী ও সেরা পুতুলের গল্প’, ‘বঙ্কল’, প্রভৃতি এস্থানীয় গল্প। গল্পগুলির মধ্যে লিঙ্গভেদে নারী কীভাবে পুরুষ ও সমাজতন্ত্রের দ্বারা প্রতিনিয়ত শোষিত ও বঞ্চিত তার বর্ণনা পাই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণাও বদলেছে। এত সময় যে নারীরা শোষিত ও নির্যাতিত হত, আজ তারাই নিজ-স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে নারীত্বের অপব্যবহার করে হয়ে উঠেছে শোষক ও নির্যাতক। নারীর ঈর্ষা, মিথ্যা ছলনা ও মোহের দ্বারা নিজ-স্বার্থ সিদ্ধির দ্বারা প্রতিনিয়ত পুরুষদের শোষণ করে চলেছে। বর্তমানে এই লিঙ্গ কেন্দ্রিক শোষণ ও ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে সমাজে নারীরা যেভাবে শোষিত হচ্ছে, ঠিক একই ভাবে শোষিত হচ্ছে পুরুষরাও। ‘পরি, জঙ্ঘিনী ও অন্নপূর্ণারা’, ও ‘নাগরী’ গল্পদুটি এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। লিঙ্গ-শোষণের এই উভয়মুখী দিকটি তিলোত্তমা মজুমদার তাঁর গল্পগুলির মধ্যে সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন যা বাংলা ছোটগল্প-ধারায় নতুন রূপে সংযোজিত হয়েছে।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, ‘নারীর মূল্য’, বাক-সাহিত্য, ষষ্ঠ মুদ্রণ - ফাল্গুন, ১৩৬৪, পৃ. ৮
২. তদেব, পৃ. ১২-১৩
৩. মজুমদার, তিলোত্তমা, ‘পঞ্চাশটি গল্প’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০৩১, প্রথম প্রকাশ - এপ্রিল ২০১২, তৃতীয় মুদ্রণ - আগস্ট ২০১৫, পৃ. ১৪৬
৪. তদেব, পৃ. ১৪৬
৫. তদেব, পৃ. ১৪৩

৬. তদেব, পৃ. ১৪৭
৭. মজুমদার, তিলোত্তমা, 'ঋ', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ - ডিসেম্বর ২০০৩, সপ্তম মুদ্রণ - জুলাই ২০১৮, পৃ. ৭০
৮. তদেব, পৃ. ৭৩
৯. তদেব, পৃ. ৭৩
১০. তদেব, পৃ. ৩০৫
১১. তদেব, পৃ. ৩১২
১২. তদেব, পৃ. ৩১৫
১৩. তদেব, পৃ. ৩১৫
১৪. তদেব, পৃ. ৩১৬
১৫. তদেব, পৃ. ৩১৬-৩১৭
১৬. মজুমদার, তিলোত্তমা, 'পঞ্চাশটি গল্প', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
২১. মজুমদার, তিলোত্তমা, 'গল্প সংগ্রহ', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ - এপ্রিল ২০২০, পৃ. ১৭৭
২২. তদেব, পৃ. ১৮১
২৩. তদেব, পৃ. ১৮৩
২৪. তদেব, পৃ. ১৮৩
২৫. তদেব, পৃ. ১৮৩
২৬. তদেব, পৃ. ১৮৫
২৭. তদেব, পৃ. ১৮৫-১৮৬